ইন্টারনেট শাটডাউনে যেভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পৌঁছেছিল জুলাইয়ের খবর

সাংবাদিক শফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও কীভাবে বাংলাদেশের সহিংসতা ও গণহত্যার চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পৌঁছেছিল, সেই অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তৎকালীন এএফপির বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ শফিকুল আলম।

ইন্টারনেট শাটডাউনের সেই সংকটময় সময়ে তার অফিসে সচল থাকা বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, আল জাজিরা, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসসহ দেশি-বিদেশি প্রায় ৫০ জন সাংবাদিককে সংবাদ, ছবি ও ভিডিও পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নানা চাপ ও হুমকির মধ্যেও কীভাবে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ঘটনাগুলো বিশ্বের সামনে তুলে ধরার কাজ চলেছিল, ইনসাইটার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় সেই বিস্তারিত অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন শফিকুল আলম। বর্তমানে তিনি ইংরেজি দৈনিক ডেইলি ওয়াদার সম্পাদক এবং এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনেকেরই প্রশ্ন জাগতে পারে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকার সময়ে কীভাবে বাংলাদেশের গণহত্যার চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পৌঁছেছিল।

‘Shoot on sight’ বা দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়ে শত শত মানুষ হত্যার অভিযোগের মধ্যে দেশের স্থানীয় গণমাধ্যমও যখন কার্যত ব্ল্যাকআউটের মধ্যে ছিল, তখন ইন্টারনেট চালু হওয়ার পর পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে কেন এত দ্রুত ইন্টারনেট চালু করার প্রয়োজন হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশ কার্যত একটি ডিজিটাল কারাগারে পরিণত হয়েছিল। দফায় দফায় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেশকে কার্যত ‘কমিউনিকেশন ব্ল্যাকআউট’-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমন সংকটময় সময়ে এগিয়ে আসেন তৎকালীন এএফপির বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ শফিকুল আলম। তিনি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমকে তার অফিসের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দেন। ফলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আবারও জানতে শুরু করে পুরো বিশ্ব।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরও সবার আগে ব্রেক করেন শফিকুল আলম। মূলত তার সেই সংবাদই বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে। পরে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইংরেজি দৈনিক ডেইলি ওয়াদার সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

ইন্টারনেট শাটডাউনের দিনগুলোতে কীভাবে ডিজিটাল কারাগারের ভেতর থেকেও বাংলাদেশকে মুক্ত বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিলেন, সেই পুরো গল্পই তিনি ইনসাইটার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় জানিয়েছেন। তার বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

১৭ জুলাইয়ের সেই থমথমে রাত। চারদিকে তখন এক অদ্ভুত নীরবতা। এর পরপরই পুরো দেশের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা তখন অফিসেই ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমাদের অফিসের ইন্টারনেটও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। চারপাশের পরিস্থিতি তখন দ্রুত বদলে যাচ্ছিল, হলগুলো খালি করে দেওয়া হচ্ছিল। এই চরম সংকটের মুহূর্তে আমাদের কাভারেজ সচল রাখতে অফিস থেকে দ্রুত সোনারগাঁও হোটেলে একটি রুম ভাড়া করা হয়। যাতে অন্তত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা যায়।

১৮ জুলাই সকালে অফিসে এসে আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। পুরো দেশে কারও ইন্টারনেট নেই। কিন্তু আমাদের অফিসে ইন্টারনেট সচল। আসলে আমরা ভিস্যাটের মাধ্যমে হংকং থেকে একটি বিকল্প লাইন টেনে রেখেছিলাম। যার কারণে সারাদেশে ব্ল্যাকআউট চললেও আমরা সংযোগ ধরে রাখতে পেরেছিলাম।

আমাদের কাছে ইন্টারনেট আছে—এই খবর জানতে পেরে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো যোগাযোগ শুরু করে। প্রথমে রয়টার্সের এশিয়া চিফ আমাদের চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর এশিয়া চিফ আমাকে সরাসরি ফোন দিয়ে বলেন, ‘তুমি কি ওদের সাহায্য করতে পারবা? এটা সম্পূর্ণ তোমাদের সিদ্ধান্ত। তুমি কমফোর্টেবল ফিল করলে দাও, না চাইলে জোর নেই। কারণ কোনো বিপদ বা আইনি ঝামেলা হলে তো সেটা তোমার ওপরই আসবে।’

ঝুঁকিটা যে পুরোপুরি আমার ওপর থাকবে, সেটা জানতাম। তারপরও ভাবলাম, এই সংকটের সময়ে আমরা একা ইন্টারনেট সংযোগ সচল রেখে স্বার্থপরের মতো বসে থাকব, এটা কেমন দেখায়। তাই আমি রয়টার্সকে আমাদের অফিস থেকে কাজ করার অনুমতি দিলাম।

এরপর যেন বাঁধ ভেঙে গেল। রয়টার্সের পর একে একে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, আল জাজিরা, নেত্র নিউজ, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও স্প্যানিশ নিউজ এজেন্সি ইএফইর প্রতিনিধিরা আমাদের অফিসে হাজির হন।

শুধু বিদেশি সংবাদমাধ্যম নয়, দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও সেখানে আসতে শুরু করেন। ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন, কালের কণ্ঠ ও সমকালের মতো প্রভাবশালী দৈনিকগুলোর সাংবাদিকরাও আমাদের অফিসের সংযোগ ব্যবহার করেন। কারণ বাইরে তখন ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটছিল, অথচ তারা কোনো সংবাদ, ছবি বা ভিডিও পাঠাতে পারছিলেন না।

ক্যালিফোর্নিয়া প্রবাসী এক চিকিৎসক ভাইও রাতে এসে তার অনলাইন পরীক্ষার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের অনুরোধ করেন। আমরা তার জন্যও অফিস খোলা রাখি।

আমাদের অফিসে কম্পিউটার ছিল মাত্র পাঁচটি। অথচ সেখানে কাজ করতে এসেছিলেন প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক। ফলে সবার জন্য সময় ভাগ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। পরবর্তী ছয়-সাত দিনে বাংলাদেশ থেকে যত বিদেশি সংবাদ পাঠানো হয়েছে, তার বড় অংশই আমাদের অফিসের সংযোগ ব্যবহার করে পাঠানো হয়। সবাইকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট করে সময় দেওয়া হতো। যার জরুরি কাজ বা ছবি-ভিডিও পাঠানো শেষ হলে তিনি অন্যজনকে সুযোগ দিতেন। ভিডিও ফাইল পাঠাতে অনেক সময় লাগত, তারপরও আমাদের ছোট্ট অফিস কক্ষ থেকেই সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

বাইরে তখন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। কিন্তু আমাদের অফিসের ভেতরের পরিবেশটা হয়ে উঠেছিল একেবারে অন্যরকম, যেন একচিলতে মুক্ত দুনিয়া। সবার জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতাম, নাশতা ও পানি খাওয়াতাম। প্রতিদিন সেখানে যেন এক ধরনের হাটবাজার বসে যেত।

তবে এর পেছনে ছিল তীব্র মানসিক চাপ। চারদিক থেকে হুমকি আসছিল। সরকারের প্রেস ব্রিফিংয়েও আমাদের ইঙ্গিত করে পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছিল, এইভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা 'ইলিগাল'। ইন্টারনেট বন্ধের মধ্যেও আমরা কীভাবে সংযোগ চালু রেখেছি, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল।

শোনা গেল, আমার নামে অভিযোগ করা হয়েছে। আওয়ামীপন্থী সাংবাদিকদের কেউ কেউ ফোন করে হুমকিও দিচ্ছিলেন—'হ্যাঁ ভাই, দেইখেন, আপনারে কিন্তু পুরো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি... ইয়ে... ইত্যাদি।' আওয়ামী লীগের মন্ত্রী আরাফাত ও হাসান মাহমুদ তাদের প্রেস ব্রিফিংয়েও পরোক্ষভাবে আমাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু আমরা আমাদের নৈতিক জায়গা থেকেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমার চোখের সামনে তখন ফটোগ্রাফারদের পাঠানো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ছবিগুলো ভেসে উঠছিল। আমি জানতাম, এসব সত্য যেকোনো মূল্যে বাইরে পৌঁছানো দরকার। আমি একা কোনো সংবাদ পাঠালে হয়তো তা একটি নির্দিষ্ট ডেস্কে পৌঁছাত। কিন্তু সবাইকে সুযোগ করে দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি একযোগে পুরো বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই পুরো কাজে আমি একা ছিলাম না। আমার ফটোগ্রাফার সহকর্মী মনিরুজ্জামান, ভিডিওর মাজেদ এবং ফ্যাক্ট চেকিংয়ের কদরুদ্দীন শিশির ও ইয়ামিনসহ সবাই জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। আমরা সকাল ৬টায় অফিস খুলতাম। কাজ শেষ করে বের হতে কোনো কোনো দিন রাত ১২টা, এমনকি ২টাও বেজে যেত।

সবাই বলতে শুরু করেছিল, আমার অফিস সরকারবিরোধী নিউজের একটি ডেন বা আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল, 'আপনে খুন করবেন, আর আমরা এটা বিদেশে নিউজ দিতে পারবো না?' আমার চোখের সামনে মানুষ খুন হচ্ছিল। আমাদের ফটোগ্রাফাররা সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ছবি পাঠাচ্ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যারা অন্য সময়ে একে অপরের পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এই সংকটের সময় তারাই এক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ শেষ পর্যন্ত সবার লক্ষ্য ছিল একটাই—বাংলাদেশের ঘটনাগুলো বিশ্বের সামনে তুলে ধরা এবং সংবাদগুলো দেশের বাইরে পাঠানো।

আজ পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, জীবনের সব ঝুঁকি ও চাপের মধ্যেও ওই ছয়-সাতটি দিন আমার সাংবাদিকতা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও গর্বের অধ্যায় হয়ে থাকবে।

শফিকুল আলম
সম্পাদক, ডেইলি ওয়াদা
সাবেক প্রেস সচিব, অন্তর্বর্তী সরকার
সাবেক বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ, এএফপি

LENS ASIA